গনপ্রজাতন্ত্রী প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

তার অর্জন ও সাফল্য

অক্টোবর, ১৯৬৮। পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খানের ১০ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় ব্যাপক গণ-আন্দোলন। কিছুকাল পর পূর্ব পাকিস্তানে যখন এই আন্দোলনের হাওয়া এসে লাগলো, তখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবী সম্বলিত ছ' দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। আইয়ুবের অধ্যায়ের পর সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য সরাসরি দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও গন-অভ্যুত্থানের ব্যাপকতাদৃষ্টে একথা তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দেশে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পুনঃপ্রবর্তন অসম্ভব এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গণদাবী অপ্রতিরোধ্য। এই অবস্থায় কেন্দ্রে একটি বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন সামরিকচক্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নানা দ্বিপাক্ষিক গোপন সমঝোতা গড়ে তুলতে থাকে। এরই ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং বিশেষত পূর্ব বাংলার উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নের ফল হিসেবে এই অঞ্চলে নির্বাচনের রায় প্রায় সর্বাংশে যায় আওয়ামী লীগের ছ' দফার অনুকূলে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়ী হয়ে ৩১৩ আসন বিশিষ্ট পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই ফলাফল ছিল পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সমূহ আঘাত। সরকার গঠনের পূর্ববর্তী পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষমতাসীন সামরিকচক্র পরোক্ষ পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের আশা ত্যাগ করে এবং তাৎপরিবর্তে প্রত্যক্ষ সামরিক পন্থায় ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনা তৈরিতে উদ্যোগী হয়।

পাক জান্তা তাদের পেশাগত প্রবণতার দরুন সামরিক শক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানের দুরারোগ্য রাজনৈতিক সঙ্কটের ওপর এহেন সামরিক সমাধান চাপিয়ে দেবার সাথে সাথে পাকিস্তানের বিপর্যয় ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানে নানা গড়িমসির পর ভুট্টোর মাধ্যমে কিছু শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। জান্তা পরোক্ষভাবে একথাই জানিয়ে দেয় যে, ছ' দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আওয়ামী লীগ ছ' দফার সংশোধনে সম্মত না হলে পরিষদ

অধিবেশনের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ছ' দফার পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের সর্বসম্মত রায়ের ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে এমন আপোস করাটা ছিল রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল।

এ দিকে জাতীয় পরিষদের বৈঠক বাতিলের ফলে সারা পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিস্ফোরণ ঘটে। অভূতপূর্ব এই গণ-অভ্যুত্থানকে একটি অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত করে আওয়ামী লীগ অসামন্য সাফল্য অর্জন করে। এমতাবস্থায় সামরিক জান্তা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে একমাত্র চূরান্ত আঘাতের মাধ্যমেই বাঙালীদের এই নতুন আত্মপ্রত্যয় প্রতিহত করা সম্ভব। শুরু হয় সামরিক কায়দায় গণ-বিক্ষোভ দমনের প্রচেষ্টা। ফলশ্রুতিতে তিন সপ্তাহাধিক কালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রুপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানের নৃশংস গণহত্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঘোষণা তখন এক অলিখিত সংগ্রামের নির্দেশনা হিসাবে আবর্তিত হয়।

২৫শে মার্চ রাতে এবং ২৬শে মার্চ নিরস্ত্র বাঙালীর উপর পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়।। যা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জন্য ছিল আত্মঘাতী। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ায় এবং বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' (ইপিআর) এর সদর দফতরের উপর পাকিস্তানের আক্রমণ চালাবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঢাকার বাইরে ঘটনা মোড় নেয় বিদ্রোহের দিকে। যার প্রেক্ষিতে বাঙালী পুলিশ, ইপিআর এবং ইবিআর বিভিন্ন স্থানে আত্মরক্ষা ও দেশপ্রেমের সমন্বিত তাগিদে, কোন নেতৃত্বের আহ্বান ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই, প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। ২৬ মার্চের শুরতেই বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের দখলে আসা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬শে মার্চ দুপুরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান এবং ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ৮ইবির নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। (তথ্য) এই ঘোষণাগুলো দ্রুতই ছড়িয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপরদিকে পাক বাহিনীর গোলাগুলি, হত্যা ও অগ্নি-সংযোগের ফলে সকল শ্রেণির মানুষজন শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে সীমান্তে এবং অতপর ভারতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানী বাহিনীর এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্বে তিনটি ভিন্ন উদ্যোগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

- প্রথমত ইপিআর, ইবিআর সেনা সদস্য ও অফিসারদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা।
- দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের যুব নেতাদের মাধ্যমে গঠিত বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

- তৃতীয়ত আওয়ামী নেতৃত্ব, যার চালক হিসাবে একজনের ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি আওয়ামী লীগের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল তাজউদ্দীন আহমদ।

সশস্ত্রবাহিনীর বিদ্রোহের বিবরণী:

২৫শে মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ আত্মগোপন করলেও ২৭শে মার্চ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন।

"প্রথমে আত্মরক্ষা, তারপর প্রস্তুতি এবং সবশেষে পাল্টা আঘাতের পর্যায়ক্রমিক লক্ষ্য স্থির করে সসঙ্গী তাজউদ্দীন আহমদ পশ্চিম বাংলার সীমান্তে গিয়ে হাজির হন ৩০শে মার্চের সন্ধ্যায়।" (মূলধারা ৭১ সম্পূর্ণ সূত্র যোগ করতে হবে)

ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী সরকার গঠনের সিধান্ত প্রসংগে তাজউদ্দীন আহমদ বলেনঃ

"পালিয়ে যাবার পথে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতালাভের চেতনার যে উন্মেষ দেখে গিয়েছিলাম সেটাই আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সিধান্ত নেবার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল। জীবননগরের কাছে সীমান্তবর্তী টুঙ্গি নামক স্থানে একটি সেতুর নিচে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হোল, একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা।" (মুক্ত বাংলাদেশে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই বক্তব্য রাখেন। দৈনিক পূর্ব দেশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২)

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ৩রা এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে তার আগে তাজউদ্দীন আহমদকে কিছু মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। যেমন-

- ইন্ধিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকে তাঁর ভূমিকা নিরুপন।
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সংকল্প, বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের জন্য একটি স্বাধীন সরকার গঠন
- শরনার্থী ব্যবস্থাপনাসহ মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা লাভ।

অতপর অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং ব্যারিস্টার আমীর–উল–ইসলামের সাথে আলোচনা ও সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধীকে তাজউদ্দীন আহমদ জানান যে ২৫/২৬ মার্চেই পাক আক্রমণ শুরু হলে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। অতপর পূর্ব বাংলার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। (তথ্য সংযোজন)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সবধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিলে আওয়ামী লীগের এমএনএ এবং এমপিও-দের বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করে অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ অধিবেশনে কতিপয় পরিষদ সদস্য ও যুব নেতাদের একাংশ সরকার গঠনের বিরোধিতা করলেও অবশেষে সরকার ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার স্বার্থে সর্বসম্মতিতে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়।

মন্ত্রীপরিষদ গঠন:

১০ এপ্রিল উক্ত মন্ত্রিপরিষদ, এমএনএ ও এমপিএ-গণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম রচিত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'র (Proclamation of Independence) ভিত্তিতে প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র: (যোগ)

সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম. এনসুর আলী, মোশতাক আহমেদ ও এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান-কে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য করা হয়। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এই মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণা প্রদান করেন।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ বাংলাদেশের মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করে।

শপথ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত:

শপথ গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, তা আয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেসময় মেহেরপুরের সাবডিভিশনাল অফিসার তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী

"এমন একটি জায়গা বাছাই করতে বলা হয়েছিলো যেখানে ভারত থেকে সহজেই ঢোকা যায়, যে এলাকা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে - বিশেষ করে আকাশ থেকে এবং বাংলাদেশের দিক বিবেচনা করলে একটু যেন দুর্গম

হয়। বৈদ্যনাথতলায় একটি মঞ্চ বানানো হয়। মঞ্চে সাতটি বা আটটি চেয়ার ছিল, যার একটি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য খালি ছিল। সেখানে 'ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' পাঠ করলেন গণপরিষদের স্পিকার ইউসুফ আলী। তিনিই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ তার ভাষণে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

''আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাওয়ার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।'' (এলাহীর বক্তব্যর তথ্যসুত্র)

১০ এপ্রিল ভাষণের লিংকঃ (ভাষণ যোগ করতে হবে)

সেদিন অনুষ্ঠানে অন্তত পক্ষে একশো' সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছিলেন, আর তাদের মধ্যে ছিলেন অনেক বিদেশী সাংবাদিক "(তথ্য সুত্র)**:**

বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাজধানী 'মুজিবনগর' নামকরন

উপস্থিত সাংবাদিক ও নেতৃবৃন্দের সামনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথ তলার এই আম্রকাননের নামকরন করেন, "মুজিব নগর"-যা ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাজধানী। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন "যুদ্ধাবস্থায় সরকার যেখানে যাবে সেই স্থানের নাম হবে মুজিব নগর।(তথ্য সুত্র)

আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত কার্যকর ও সুসংগঠিত ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার ।

- সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকার গঠন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব
- এক কোটির ওপর শরনার্থীর জন্য ত্রাণকার্যক্রম
- মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা যুবকদের যুবশিবিরে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন
- স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং
- বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়

এসব বিষয় ছিল ১৯৭১ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় অনন্য কীর্তি ও সফলতা ।

প্রথম সরকারের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের বিস্তারিত:

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এই নামকরণ হতেই এটা পরিস্কার যে এটা প্রজাতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক। যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সর্বোচ্চ নেতা এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদ হয়েছিলেন দলনেতা। আর তিনিই মুজিবনগরে গঠন করেন মন্ত্রিপরিষদ।

মূলত প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও বেতার, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এসবই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিল। খন্দকার মোশতাক আহমেদকে দেওয়া হয়েছিল পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় বিষয়সমূহ। অর্থ, রাজস্ব, বানিজ্য ও শিল্প, পরিবহণ ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর দায়িত্বে ছিল। এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীপ্রধান এবং অধিকন্তু মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অপর তিন মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন মূলত সরকার পরিচালনায়।

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিমবাংলার কোলকাতায়। বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরে যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগ দিয়েছিলেন এদের অনেকে পূর্ব বাংলার দপ্তর পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে এবং সরকারের প্রশাসনে যোগ দেন।

এছাড়া সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত যেসকল কর্মকর্তা অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং পাকিস্তানের বিমান ও নৌবাহিনীর পক্ষত্যাগী সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারে যোগদানের ফলে বিভিন্ন সেক্টর ও কার্যালয় যুক্ত হতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ জুন মাসের এক বৈঠকে যুদ্ধপরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে যুদ্ধাঞ্চল ও সেক্টর গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১১ জুলাই উচ্চপদস্থ ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক হয় এবং মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ও কৌশল আলোচনা করা হয়। একই দিনে ১১ টি সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের রণকৌশল, সেক্টর, ব্রিগেড ও যুদ্ধাঞ্চল বিবরণী:

মুক্ত এলাকায় কর্তৃত্ব এবং পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ ও কৌশল নির্ধারণের জন্য এই নিয়মিত বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ব্যাপক।

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধকে আরো বেশি সুসংগঠিত করতে ইপিআর, ইবিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও প্রশিক্ষিত যুবকদের সমন্বয়ে 'জেড-ফোর্স', 'কে-ফোর্স', ও 'এস-ফোর্স' নামে তিনটি বিগ্রেড গঠন করা হয়। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে সমগ্র যুদ্ধাঞ্চলকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করে যৌথ কমান্ড গঠন করে।। চূড়ান্ত বিজয় অর্জন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এ কমান্ড ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

প্রথম সরকারের অনুরোধেই ভারত-সরকার আমাদের ছাত্র-যুবক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষদের যুদ্ধ-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিয়েও সহায়তা করে। আর এসকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী অস্ত্র নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করে।

মুক্তিযুদ্ধে গণ-মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ:

বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে যাঁরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন যোগানের কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন। বস্তুত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হত। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশের জনগনই স্বতস্ফূর্তভাবে জনমত সৃষ্টির কাজ করেন। বিদেশি সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির যৌক্তিকতা এবং পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে কী নৃশংস হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞে চালাচ্ছে তা বোঝাতে পেরেছিলেন।

পাশাপাশি বিদেশি প্রচার মাধ্যমের সমর্থন ও তাদের প্রচারণা ছিল বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রিক । বস্তুত প্রবাসি বাঙালিরাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রচারণা ও সমর্থণ আদায়ে সক্ষম হয়েছিল। নিদের্শনা বা বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে থাকতেন।

প্রথম সরকারের জারিকৃত কতিপয় নির্দেশনা:

জুন মাসে যুদ্ধকালীন সময়ে যুব শিবির ও অভ্যর্থনা শিবির গঠনের মতো কার্যকরী সিদ্ধান্ত, ১৭টি আলাদা শিবির এবং তাদের জন্য অর্থের যোগান করাটাও ছিল এই সরকারের অন্যতম সাফল্য। মূলত শরনার্থী শিবির হতেই যুবশিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন ঘটে। সাহসী ও বুদ্ধিমান, অস্ত্র পরিচালনা ও গেরিলাযুদ্ধে দক্ষদের পাঠানো হত দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে। এছড়া ভারতীয় বাহিনীও যুব শিবির হতে বাছাই করে নিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকতো। যা মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক তৎপরতা তরান্বিত করে।

যুব শিবিরের বিস্তারিত:

আমেরিকার জনগন ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশকে সমর্থন দিলেও ক্ষমতাসীন নিক্সন-কিসিঞ্জার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। পাশাপাশি সোভিয়াত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে থাকলেও চীন বিরোধিতা করেছে। তবে গ্রেট ব্রিটেনসহ অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমর্থন দিয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশের পক্ষে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে যে মিছিল অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বৃহত্তম সমাবেশ।

প্রথম সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য:

যোগ কর সোভিয়েত সমর্থন লাভে সরকারের ভূমিকা (বাংলাদেশ-ভারত-সোভিয়েত সমন্বয় সেল গঠন-তথ্য সুত্র)

অক্টোবর মাসে মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে সার্বিক পরিস্থিতি ও পরবর্তী করণীয়সহ অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনা হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমা দেশগুলো সফর করে তাদের অবস্থান জানার পর ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হন এবং বাংলাদেশ-ভারত সামরিক যৌথকমান্ডের নেতৃত্বে পাকিস্তানী বাহিনীকে প্রতিহত করার নকশা প্রণয়ন করেন। এরপর ১৯-২০ নভেম্বর বাংলাদেশ–ভারত সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয় ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এসব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল:

- বিজয়
- বাংলদেশকে শত্রুমুক্ত করা
- যৌথ কমান্ড স্থাপন
- সামরিক চুক্তি
- শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন
- খাদ্য সরবারহ
- চিকিৎসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ নানা দিক

ডিসেম্বরের শুরুতে যৌথবাহিনী ও পাকিস্তানী বাহিনীর পদাতিক ব্রিগেড, ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীর অংশগ্রহণে অনেকটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরী হয়। তার আগেই বাংলাদেশ সরকার

- পরিকল্পনা সেল
- পুনর্বাসন সেল
- আইন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন
- বাসস্থান ও জনস্বাস্থ্যসহ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সমন্বয়ের কাজ সম্পন্ন করে।

প্রথম সরকারের বিভিন্ন সেলের বিস্তারিত:

এমনকি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরুর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বেতারে সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা জারি করা হয়।

প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ (ডিসেম্বর ১৯৭১):

৬-১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথবহিনী কর্তৃক দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে এবং ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণের বিস্তারিত:

ঐদিনই কোলকাতা থেকে বাংলাদেশ সরকার দেশে বেসামরিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে জেলা প্রশাকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠাতে থাকে। ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন,

"এত দ্রুত ও উচ্চমূল্য দিয়ে কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করেনি। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করা এবং ধ্বংসস্তুপের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য অনেক কাজ করতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বিস্তারিত (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১):

১৮ ডিসেম্বর মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে সশস্ত্রবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তকরণ ও বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ ও সরকারের দপ্তরে নিয়োগ ও কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দেয়া আরম্ভ হয়। ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা ঢাকা আসে এবং বিপুল মানুষের সম্বর্ধনা পায়।

প্রথম সরকারের ঢাকায় আগমন ও গণসম্বর্ধনা: